বিপরীতকরণী বটিকা

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

লিইবার ফিয়েরা

মুখবন্ধ

প্রকাশক মহোদয় অনুরোধ করেছেন, সৃজনাত্মক রচনার প্লট কীভাবে আসে, এ বিষয়ে কিছু বলতে। যে লেখা ইতিহাসভিত্তিক বা বাস্তবানুগ সেসব লেখার ক্ষেত্রে কালানুক্রম একটা আবশ্যিক শর্ত। সেই সব লেখার সাথে একেবারে ফিকটিশাস লেখার একটা গুণগত পার্থক্য আছে। এ ধরনের রচনা লেখক মানসে কীভাবে জারিত হয়, কীভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে এ প্রশ্ন লেখকের কাছে বিড়ম্বনার বৈকি। সকলের ক্ষেত্রে কিনা বলতে পারব না। আমার কাছে নিশ্চয়ই। 'হাস্যরসাত্মক কল্পবিজ্ঞান' লিখব বলে আমি কলম ধরিনি। একটা নতুন ধারা বা একটা নিজস্ব স্টাইল নির্মাণ করব এসব কোনও উদ্দেশ্যই ছিল না। হ্যাঁ, উদ্দেশ্য ছিল, নিছক মজা তৈরি করা। একটা চরিত্র বা প্রথম একটা পছন্দসই লাইন চলে এলে বাকি সব দরকারি চরিত্ররা কীভাবে যেন আপনা থেকেই চলে আসতে থাকে। ছোটদের জন্য একটা মজাদার কাহিনি লিখব এটা মাথায় থাকলেও আসলে লেখাটির ভিতর এমন অনেক অভিব্যক্তি আছে যা ছোটদের জন্য নয়। সেজন্য লেখাটি বড়দেরও। ছোটরা স্রেফ গল্পের রস পাবে। কিন্তু বড়রা পাবে গল্পের রস বাদেও মজার আঙ্গিকে অন্য নানান অলিগলি অলিন্দ।

বোধহয় বিজ্ঞানের প্রতি আবাল্য অনুসন্ধিৎসা, ভালবাসা ও হাস্যরসের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ, এই দুই মনোভাব মানব-রসায়ন প্রক্রিয়ায় এক আলাদা ধরনের মেলবন্ধন, নিজের অজ্ঞাতসারেই ঘটে গিয়েছে লেখার মধ্যে।

লেখা উত্তীর্ণ হবে কিনা তা লেখকের জানা থাকে না। রচনার বহমানতা প্রথমে পুরোটাই অনির্দিষ্ট থাকে, ক্রমশ সামনের ঘটনাগুলো স্পষ্ট হতে থাকে। শেষ হলে দেখা যায় কী হল, কীভাবে হল তা ব্যাখ্যা করা মুশকিল।

নির্মল হাস্যরস ছোটদের মনোরঞ্জন করে, এটা আমরা নিজেদের শৈশবের দিকে ফ্ল্যাশব্যাক করলেই বুঝতে পারি। সমাজে আমরা অনেক রকম মানুষ দেখি, গল্পের চরিত্ররা সাধারণত হুবহু তাদের মতো হয় না। হলে সেখানে

কল্পনার কোনও ভূমিকা থাকত না। বাস্তব থেকেই নেওয়া কিন্তু ফোটোগ্রাফির মতো হুবহু বাস্তবের প্রতিলিপি নয়। লেখকের নিজস্ব নির্মাণের সুযোগ আছে এখানে। বাস্তবের মতো অথচ বাস্তব নয়, আবার পুরোপুরি অবাস্তবও নয় শিল্পী এই দুই অবস্থানের মাঝামাঝি আলাদা একটা পরিসর, একটা স্পেস নির্মাণ করে। কার্টুন শিল্পী হুবহু একজন মানুষের বা ব্যক্তির পোর্ট্রেট আঁকেন না। লম্বা নাককে আরও লম্বা করে দেওয়া, পুরু ঠোঁটকে আরও পুরু বা ছোট চোখকে আরও ছোট করা কার্টুন শিল্পী আনুপাতিক হারকে অদল বদল করেই মজা সৃষ্টি করেন। অনেক কিছুই বদলে যাওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিটিকে চিনতে পারা যায় এটাই এই পারমুটেশন কম্বিনেশন যা বাস্তবকে বজায় রেখেও সৃষ্টি করে এক অন্য ডাইমেনশন।

হাস্যরসাত্মক রচনার ক্ষেত্রেও একই প্রণালী অবলম্বন করা হয়ে থাকে। স্বভাবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, বাস্তবে দেখা চরিত্রের তুলনায়, লেখার চরিত্রের ক্ষেত্রে সৃজনশীল ব্যক্তিটির কল্পনার ল্যাবরেটরিতে চোলাই হয়ে আসে। রসবোধের ফিল্টারে ছাঁকা হয় বাস্তবের ঘটনাকে।

কোনও কিছু বাড়িয়ে বলা, নানান মুদ্রাদোষ, বলতে গিয়ে কথা বিকৃত করে ফেলা, উচ্চারণের বিপর্যয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থ সৃষ্টি হওয়া এসব হাস্যরস ঘরানার অতি পরিচিত উপাদান। তা ছাড়াও আরও কত কী যে হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারে তা তো একজন লেখকেরও অজানা। অনাগত দিনের প্রকাশভঙ্গি, রসের উপাদান, বর্তমান লেখকদের অজানা।

অনেক নতুন নতুন ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে এগিয়ে চলা, এ শৈলী এক বহমান স্রোতের মতো।

হিরন্ময় ভট্টাচার্য

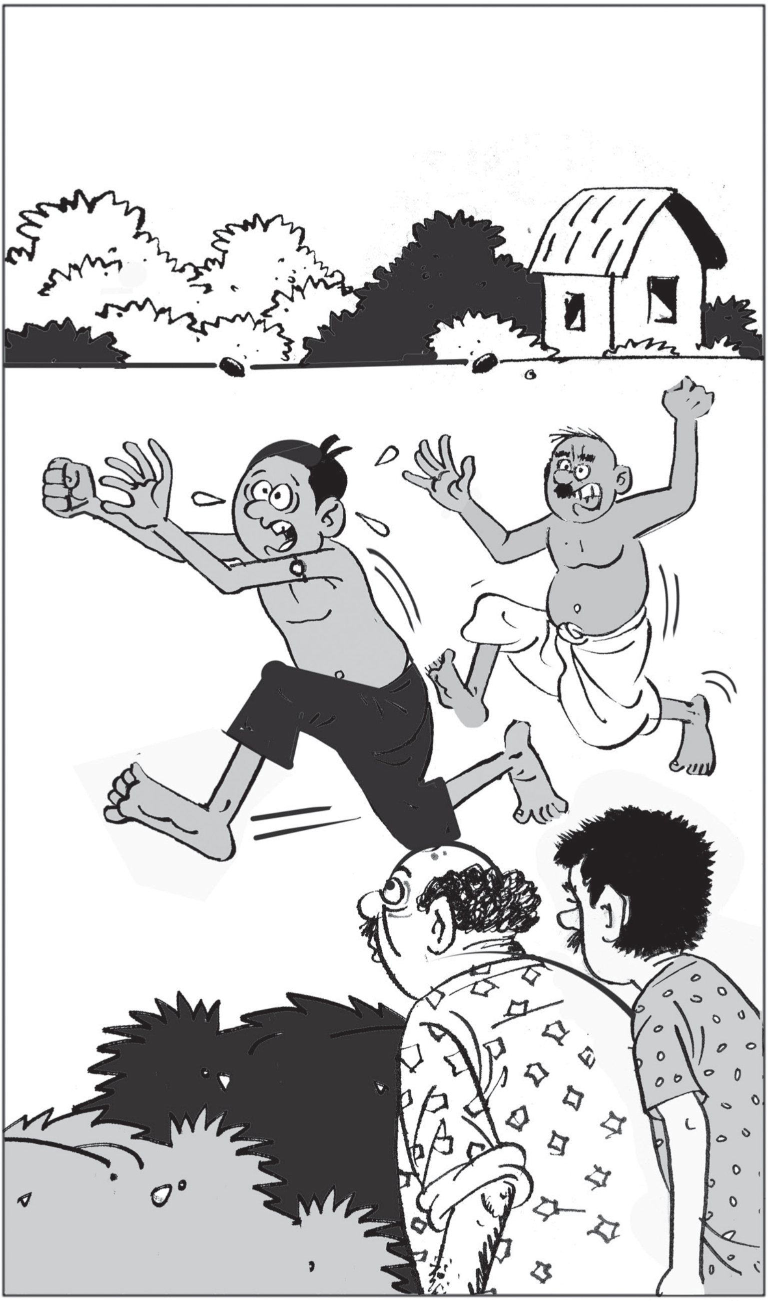

এক

'যত যাই বলো, মাধ্যাকর্ষণের ওপর আর কিছু হয় না। যদি আবিষ্কার করতেই হয়, ঐরকম কিছুই করে দেখাবো।' কথাটা বলল, নিতাই বারিক। উপেন দাস তখন কাঠি দিয়ে কানের খোল সাফ করছিল। চমকে ওঠাতে কানের পর্দায় লেগে গেল একটা জব্বর খোঁচা।

'দিলে তো চমকে। এখন যদি কানের ভেতর কিছু ভালোমন্দ হয়ে যায়, তোমার মাধ্যাকর্ষণ মলমে কোনো কাজ হবে? এর আগে মকরধ্বজ লোশনের কথাটা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছ নিশ্চয়ই। বক্‌না গোরুটার মুখে মাখিয়ে সে কী বিপত্তি! লেজ খাড়া করে সেই যে পুকুরের জলে ঝাঁপ মারল, তিন বাপ-ছেলের কালঘাম ছুটে গিয়েছিল ওটাকে গোয়ালমুখো করতে। আবিষ্কারের নামটি আর মুখে এনো না এ জন্মে।'

—মাধ্যাকর্ষণ জিনিসটা মলম তোমায় কে বলল?

—কেউ বলেনি। তবে কিনা, মলম ছাড়া আর কিছু আবিষ্কার করার দরকার নেই। 'দদ্রুভৈরব' বলে একটা মলম কিনেছিলাম ট্রেন থেকে। যে কথা, সেই কাজ। তারপরে বাতবিদ্যুৎ। আমার গোরু দুটোর পিঠে ডলে দিই রোজ। মানুষের ওষুধ গোরুর ক্ষেত্রে চারগুণ লাগে জানবা।

—মাধ্যাকর্ষণ একটা অদৃশ্য ব্যাপার।

—তাহলে আর ওর পিছনে ছুটে কী হবে? গেরস্থালির কাজেই যদি না লাগল তবে আবিষ্কারের দাম কী?

—তোরা কি ভাবিস নিউটন একাই জ্ঞানসমুদ্রে নুড়ি কুড়িয়েছেন? আমরা সব বানের জলে ভেসে এসেছি নাকি? দু-চারটে আমার কব্জায়ও আছে।

—তা বটে! তবে কথাটা হল কী, তোমার এমন কিছু আবিষ্কার করা উচিত, যা গাঁয়ের লোকের বুঝতে সুবিধা হয়। শক্ত জিনিস আবিষ্কার করা গ্রামবিরোধী ব্যাপার। যা বোঝা যায় না, তা আবিষ্কার করা অনুচিত।

—কথাটা একদম ফ্যালনা নয়। তবে আমি ভাবছি নিউটন যদি আপেলগাছের তলায় না বসে ন্যাসপাতিগাছের তলায় বসতেন তাহলে ফলাফলটা কী দাঁড়াত?

এই সময় দেখা গেল পাঁই-পাঁই করে দৌড়াচ্ছে একটা পুঁচকে ছেলে। তাকে লুঙ্গি গোটাতে গোটাতে তাড়া করছে মুদি দোকানের মালিক ষষ্ঠি কলু। ব্যাপারটা কি-না দোকানের বয়াম থেকে এক খাবলা টক-ঝাল-মিষ্টি চানাচুর তুলে দে দৌড় খোকা। কিন্তু ছেলে-ছোকরার সঙ্গে দৌড়ে এঁটে উঠতে পারবে কেন ষষ্ঠি?

তখন অপ্রাকৃত ভাষার ফুলঝুরি শোনা গেল তার মুখে। আর তাতেই ধামাচাপা পড়ে গেল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রসঙ্গ।

—দেখুন নিতাইকাকা, এই নিয়ে তিনদিন হল, আগের দিন সরিয়েছে মদন কটকটি, তার আগের দিন শোনপাপড়ি। এ যে দিনে-দুপুরে ডাকাতি শুরু হয়ে গেল। আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি হাতের নাগালে পেলে ওর একদিন কী আমার একদিন। কথাটা আপনাদের জানা থাক।

উপেন বলল, —ওকে তুমি হাতের নাগালে পাবা না।

ডানকানটা ছেড়ে বাঁ কান ধরেছে উপেন। দেশলাই কাঠিটা বেশ জুতমতো বাগিয়ে ধরে কানের মধ্যে ঘুরিয়ে যাচ্ছে।

—পাব না?

—উঁহু।

—আপনি বাজি ধরবেন?

—ধরব।

—কত টাকা?

—এই ধরো গোটা সত্তর।

—আপনি হারবেন জেনেই এত কম বাজি ধরছেন।

—তা নয়। তোমার দিতে পারার সুবিধার কথাটা মাথায় রেখেই বল্লাম। তোমার হাত দিয়ে মাছি গলে না সবাই জানে। সত্তর টাকাটাই কি দেবা নাকি?

—দেখুন উপেনদা এই সকালবেলায় মেজাজটা এমনিতেই খিঁচড়ে দিয়ে গেল ফক্কর ছোঁড়াটা। কেন, আমি কি বারের পুজোয় লোক ডেকে খাওয়াই নে?

—অমন খাওয়া না খাওয়ানোই ভালো।

—কেন, মন্দটা কোথায় দেখলেন?